আফ্রিকার বিশ্বাসব্যবস্থা ও কতিপয় নাইজেরীয় উপন্যাস

এলহাম হোসেন

আফ্রিকার গোত্রীয় কাঠামোপদ্ধতি ঐতিহ্যগতভাবেই প্রাকৃতিক ধ্যান-ধারণার অলৌকিক অধিক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আফ্রিকীরা যদিও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, ভাষার বৈচিত্রে স্বতন্ত্র্য, সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে বর্ণীল, তবুও ধর্মীয় বিশ্বাসে তাদের মধ্যে এক অভিন্ন সাজুয্য লক্ষনীয়। এরা বিশ্বাস করে- এই বিশ্বব্রম্মান্ড এক অসীম ক্ষমতাধর শক্তির দ্বারা সৃষ্টি। আর তাদের প্রধান কাজ হলো, এই শক্তির প্রতি নিজেদের অকুণ্ঠভাবে নিবেদন করা। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা প্রাকৃতিক শক্তিরূপে জীবীতদের নানাভাবে সহায়তা ও পরিচালিত করে থাকেন। জীবীত ও মৃতদের মধ্যকার সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে তাদের ওঝারা। তাই এদের সমাজে ওঝাদের অবস্থান উচ্ছাসনে। তারা আধ্যাতিক গুরু এবং নানান আচার-অনুষ্ঠানের প্রাণপুরুষও এরাই।

আফ্রিকী সমাজের সর্বত্রই ওঝাদের প্রভাব বিদ্যমান। এরা "ভয়াবহ আকৃতির মুখোশও ধারন করে। নানা প্রকার মৃত প্রাণীর হাড়ই হয় তাদের প্রধান হাতিয়ার। এসব হাড় আন্দোলিত করে তারা জাদু সঞ্চালন করে" (গান্থার ৩৪৩)। আবার ওঝা হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। জঙ্গলের গভীরে গিয়ে ধ্যান করে সিদ্ধি লাভ করতে হয়। শুধু ফলমূল ভক্ষণ করতে হয়। অতপর শুধুমাত্র একটা ছোড়ার সাহায্যে একটা অজগরকে হত্যা করে তার চামড়া নিয়ে লোকালয়ে ফিরতে হয়। এই চামড়া সারাজীবন তার পোশাকের সাথে যুক্ত থাকে। এরা হাড়-গোর নাড়ানোর মাধ্যমে যাদু সঞ্চালন করতে পারে। এরা কাউকে যাদুও করতে পারে আবার যাদুর প্রভাব কাটাতেও পারে। এদের কেউ ভয়ে বিরক্ত করে না কারণ এর ফল ভালো হয় না। ওঝাদের নানারকম অলৌকিক কর্মকান্ড ইউরোপীয়দের মধ্যেও সুবিদিত আছে। জন গান্থার তাঁর *অফ্রিকার অভ্যন্তরে* (অনুবাদ) গ্রন্থে এরূপ ঘটনার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এর একটি এরূপঃ

> দক্ষিণ রোডেশিয়ার অন্তর্গত মাশোনা ল্যান্ডের এক পল্লীতে 'নেচিস্কায়া' নাম্নী এক তরুনী বালিকাকে জন্ম থেকেই বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে উৎসর্গ করে দেবীত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করা হয়েছিল। বালিকা এক নির্জন পর্বতের উপর তার মাতার সহিত বাস করত। 'চিকাঙ্গো' নামক জনৈক ওঝা ব্যতীত অপর কেউ এ দেবীরূপী বালিকার সহিত দেখা করতে পারত না। কিন্তু একবার সে অঞ্চলে ভীষন অনাবৃষ্টি দেখা দিল। ওঝা চিকাঙ্গো তখন ঘোষনা করল যে, মান্দোজা নামক জনৈক তরুণ দেবী-বালিকা নেচিস্কায়াকে ভ্রষ্ট করেছে এবং এজন্যই বৃষ্টি হচ্ছে না। গ্রামের লোকেরা তখন ক্রোধান্বিত হয়ে মান্দোজাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করল। আশ্চর্যের বিষয়, এ হত্যাকান্ডের পরই মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মান্দোজার হত্যাপরাধে ওঝা চিকাঙ্গো ও অপর তিন ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু এদের কারাদন্ড হওয়ার পর আবার ভীষণ অনাবৃষ্টির সূচনা হলো। সরকারকে তখন বাধ্য হয়েই চিকাঙ্গো ও তার তিনজন সহকর্মীকে মুক্তি দিতে হয়েছিল। (গান্থার ৩৪৪)

এরকম আরও অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা আফ্রিকার ইতিহাস ও সাহিত্যের অমূল্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আফ্রিকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুরোটাই বাকি বিশ্বের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এর মৌখিক সাহিত্য বা ওরেচারের মাধ্যমে। এর সংস্কৃতির মূলে আছে মৌখিক সাহিত্য যা প্রজন্ম

থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত হয়েছে। নিবিড় বিশ্লেষণে এটি সহজেই অনুমেয় যে, আফ্রিকী মৌখিক সাহিত্যের পুরোটা জুড়েই আছে নানান অতিপ্রাকৃতিক বিষয়, প্রাণী, বস্তু ও ঘটনার ঘনঘটা। কাজেই অপরিহার্যরূপেই আফ্রিকী লেখ্য সাহিত্যেও স্থানীয়দের দেব-দেবী সম্বন্ধে বিশ্বাস, জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ বা কল্পকাহিনী, প্রেতাত্মা ও প্রেততত্ত্ব, অসাধ্য সাধনের গল্প ইত্যাদি বেশ শক্ত জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি স্থানীয় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব প্রবাদ প্রবচন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তারও মর্মমূলে আছে এদের অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি দূরারোগ্য বিশ্বাস ও আনুগত্য। আর আফ্রিকী লেখ্যসাহিত্য এসবকিছুকে ধারন করেই অঙ্গ-সৌষ্ঠব্য লাভ করেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে আফ্রিকীরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। যদিও এদের একধিক প্রেতাত্মা বা এদের পূর্বপুরুষদের আত্মার উপস্থিতিতেও বিশ্বাসী, কিন্তু এরা একেশ্বরবাদী। এই প্রধান ঈশ্বর বা supreme God কিন্তু শুধুই স্রষ্টা। নিয়ন্ত্রণকারী নয়: " ... the Supreme Deity is not a manager, but a creator" (Asante XXIV). একেশ্বরবাদ বা বহু ঈশ্বরবাদ- আফ্রিকী প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটি পশ্চিমী। যদিও আফ্রিকী ধর্মচিন্তার মধ্যে ঐক্য আছে। তবুও আফ্রিকীদের মধ্যে তাদের ধর্মচর্চা, আনুষ্ঠানিকতা ও চর্চার ভিন্নতা দৃশ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঘানার আকান ভাষাভাষী আসান্তে ও নাইজেরিয়ার ইয়োরুবা জনগোষ্ঠী এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং রাজনৈতিক মতাদর্শে এরা রাজতন্ত্রের অনুসারী। কিন্তু এরা কেউই সর্বেশ্বরের পূজা করে না। কেনিয়ার গিকুয়ু ও নাইজেরিয়ার ইবো জনগোষ্ঠী ঈশ্বর-ভাবনায় প্রাতিস্বিক এবং সর্বেশ্বরে বিশ্বাসী। অথচ গিকুয়ুরা *নগাই* এর প্রতি অর্ঘ অর্পন করে, যে *নগাই* প্রধান ঈশ্বর নয়, গৌণ ঈশ্বর, কিন্তু সে পূজা-অর্চনা লাভ করে। আবার ইবোদের প্রধান ঈশ্বর *চুকু*ও নিয়মিত পূজা পায় না। কাজেই আফ্রিকী ধর্মপোলব্ধি পর্যালোচনা করে বলা সম্ভব নয় যে, এদের একক ঈশ্বর আছে বা বহু ঈশ্বর আছে। এদের যেমন এক ঈশ্বরের আছে বহুমাত্রিকতা আবার বহুমাত্রিক ঈশ্বরেরও আছে একক রূপায়ন। ঈশ্বরের এই যে বহুমাত্রিক রূপায়ন– এটা আফ্রিকী সাহিত্যের ক্যানভাসকে করে তুলেছে বর্ণীল ও কৌতুহলোদ্দীপক।

চিনুয়া আচেবে, যাঁকে আফ্রিকী সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা হয়, তাঁর *থিংস ফল এপার্ট* উপন্যাসে ইবো সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের এক বিশ্বাসযোগ্য কল্পচিত্র অংকন করেছেন। ইবোদের প্রধান ঈশ্বর হলো *চুকু*। তবে ছোট ছোট দেবতাও আছে যারা মানুষ আর প্রধান ঈশ্বরের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। আবার তাদের পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাও দেবতাদের সাথে নানান সংকটে মধ্যস্থতা করে থাকে সমস্যা সমাধানের জন্য। যেহেতু ইবো সমাজের প্রধানতম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হলো কৃষি, তাই তাদের দেবতারা কৃষি সংশ্লিষ্ট নানান উপসঙ্গের সাথে জড়িত । এদের কেউ মেঘ-বৃষ্টির নিয়ন্ত্রনে ব্যস্ত। আবার কেউবা ঋতুর চক্র বা চাকা ঘুরাতে নিয়োজিত। কেউ আবার জমির উর্বরতার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। এমনকি সামাজিক নানান জটিল পরিস্থিতিতে ইবোরা বিশ্বাস করে যে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মারা অংশ গ্রহণ করে ও সহায়তা করে।

থিংস ফল এপার্ট উপন্যাসে ইগুইগু বা মুখোশপরা স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এরা সমাজে উদ্ভুত সংকটকালে মানুষের অভিযোগ শোনে এবং সিদ্ধান্ত দেয়। এরা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয় এবং শাস্তিও দেয়, গ্রীক পুরাণে উল্লেখিত দেবী নেমেসিসের মত। ইবোরা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মারা তাদের রক্ষাকর্তাও বটে। উমুয়োফিয়াতে খৃষ্টান মিশনারীর যে গীর্জা যাকে স্থানীয়রা তাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতি হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে, তাকে ধূলিস্যাৎ করে দেয় এই ইগুইগুর দলই। ইবোরা বিশ্বাস করে, তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে এই ইগুইগু ঠিক কাজই করেছে। ইবোদের নেতা ওকোনকোও এই বিশ্বাসেরই ধারক ও বাহক।

ইগুইগুরা মুখোশ পড়ে কারণ ইবোরা বিশ্বাস করে যে, মুখোশ হলো একটি প্রতীকী ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পূর্ব পুরুষদের প্রেতাত্মারা জীবীতদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। তাই মুখোশ উন্মোচন বা উন্মোচনের চেষ্টা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ইনোক, যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং স্থানীয় আফ্রিকী সংস্কৃতিকে সন্দেহ করে, সে একটা ইগুইগুর মুখোশ উন্মোচন করে। তা সে করে মিশনারীদেরই উস্কানিতে। এই ঘটনা ইবোদের ব্যথিত ও অপমান করে কারণ মুখোশ তাদের কাছে এক স্বর্গীয় পর্দামাত্র যা বিরাজমান থাকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝখানে। এটিই তাদের আধ্যাত্মবাদের মূল ভিত্তি। তাই এই ঘটনা তাদের সংক্ষুদ্ধ করে। ফলে খৃষ্টানগীর্জা হয় ধূলিস্যাৎ। এঘটনার সূত্র ধরেই স্থানীয়রা এবং ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। সব কিছু হয় লন্ডভন্ড। ওকোনকো উদ্ভুত পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হয়। চেষ্টা যে করে না-তা নয়। কিন্তু তা ঔপনিবেশিক তৎপরতার বিপরীতে অতি নগন্য। তার গোত্রের লোকেরাও ইতোমধ্যে হয়ে পড়েছে বিভক্ত। এই সত্যপোলব্ধি তাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়। ফলশ্রুতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় ঔপনিবেশিকরা যাদের মুখোশ খৃষ্টান-গীর্জা।

আফ্রিকার দেব-দেবী সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী এই মহাদেশের মতই বিশাল, বৈচিত্র্যময় ও কৌতুহলোদ্দীপক। এখানকার লোক, লোকাচার ও দেব-দেবী একই সুতায় গাঁথা। গ্রীকদের মত আফ্রিকীরাও তাঁদের দেবদেবীর সত্ত্বা কল্পনায় মানবিক দোষ-গুণ তাদের উপর আরোপ করেছে। যার ফলে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার এক অমোঘ মরমী সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। দেব-দেবীর নাম ধারন করে মানুষও তার দেবতার প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছে। আচেবের *অ্যারৌ অব গড* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইজুলুর নামটাই তো তাকে দেবতা উলুর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে। 'ইজি' মানে পুরোহিত আর 'উলু' তো ইবোদের অন্যতম দেবতা। কাজেই 'ইজুলু' মানে 'উলুর পুরোহিত'। ইজুলু মনে করে তার মধ্যে দিয়ে স্বয়ং উলু কথা বলে, নির্দেশনা জারি করে। কাজেই তাকে অবজ্ঞা করা মানে হলো উলুকেই অবজ্ঞা করা।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আফ্রিকীদের দেব-দেবীরা এই মহাদেশের মতই বিচিত্র ও বিশাল ব্যঞ্জনাময়। সমগ্র আফ্রিকায় প্রায় ৩০০০ টি নৃগোষ্ঠীর বসবাস যাদের নিজেদের মধ্যে ২০০০ এরও বেশি ভাষা প্রচলিত। এদের অনেক গুলোরই বর্ণমালা নেই কিন্তু কথ্যরূপ প্রচলিত । এদের

নৃত্যকলা ও সঙ্গীত অত্যন্ত কাব্যিক ও সুরেলা। অনেক রকমের ড্রাম ও কাঠের তৈরী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে এরা নৃত্য ও সঙ্গীতের বিষয়বস্তু দর্শক-স্রোতার কাছে খুব সফলভাবে ভাস্বর করে তুলতে পারে। ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব ও ভাবের গভীরতা ধারন করে এদের ভাস্কর্য আফ্রিকার স্বকীয়তার জানান দেয় আর বুঝিয়ে দেয়-বিশ্বায়নের প্রভাবে পৃথিবীর সবাই সংকরায়নের পথে হাঁটলেও এরা আজও স্বতন্ত্র ও বিশুদ্ধ। এক এক দেশ ও সম্প্রদায়ের এক-এক দেব-দেবী আছে। যেমন- ঘানার আসান্তি সম্প্রদায়ের প্রধান দেবী *আবেরিওয়া* যাকে 'আর্থ গডেস' বা পৃথিবীর দেবী বলা হয় । নাইজেরীয় ইওরুবাদের বনদেবী *আজা*। নাইজেরীয়ার ইবোদের মধ্যে উর্বরতার দেবী *আলা*। বুরকিনা ফাসো এবং মালির দোগন সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় সৃষ্টির দেবী হলো *আমা*। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায়ের কৃষির দেবী হলো *ইনকোসাজানা*। দক্ষিণ আফ্রিকার লোভেদু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বৃষ্টির দেবী হলো *মাজাজি*। নাইজেরীয় আনাং ও এফিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতম দেবতা হলো *আবাসি*। উগান্ডার বাগান্দা সম্পদ্রায়ের মধ্যে জনপ্রিয় আকাশের দেবতা হলো *গুলু*। আবার নাইজেরীয় ইয়োরুবা সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় লোহার দেবতার নাম হলো *ওগুন*। উল্লেখ্য যে, আফ্রিকীরা তাদের অনেক ছেলের নাম তাদের দেবতার নামে এবং মেয়ের নাম তাদের দেবীর নামে রাখে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে অত্যন্ত জোরালো ও অকৃত্রিম সংশ্লিষ্টতাই নির্দেশ করে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে অফ্রিকীরা অত্যন্ত আন্তরিক এবং সর্বোচ্চ ঐতিহ্যগত প্রথা ও পবিত্রতা মেনেই তা করে থাকে। এর কারণ হলো, এরা বিশ্বাস করে যে, এই আচার পালনের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মার সাথে যোগাযোগ তৈরী করে। এদের কেউ মারা গেলে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানেও প্রচুর শব্দ তৈরী করে তা উদযাপন করা হয়। ড্রাম পেটানো হয়, এমনকি বন্দুকের গুলিও ছোড়া হয় । এমন একটি উৎসবের দৃষ্টান্ত চিনুয়া আচেবের *থিংস ফল এপার্টে*ও আছে। উয়োমুয়োফিয়ার সম্মানিত বয়োবৃদ্ধ ইজিউডু যখন মারা যায়, তখন তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপন্যাসটির মূল চরিত্র ওকোনকো বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ে উদযাপনে অংশ নেয়। কিন্তু শ্লেষাত্মকভাবে একটি গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ইজিউডুর ছেলেকে বিদ্ধ করে ও ফলশ্রুতিতে সে মারা যায়। উক্ত ঘটনার খেসারত দিয়ে ওকোনকো নিজ গ্রাম থেকে মুবান্তায় স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হয় সাত বছরের জন্য। আর ইত্যবসরে মিশনারীর কর্মকান্ড স্থানীয়দের গ্রাস করে।

নাইজেরীয় ঔপন্যাসিক যিনি ইংরেজি ভাষায় আফ্রিকী সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য, তিনি হলেন এমোস তুতুওলা। তাঁর অত্যন্ত সাহসী উপন্যাস *পাম ওয়াইন ড্রিংকার্ড* বা *তালমদিরা মাতাল*। যদিও এর ভাষা ও শৈলীগত দুর্বলতা আছে তবুও এটি অফ্রিকী সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। এই উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ইয়োরুবাদের মধ্যকার লোককথা ও পুরাকাহিনীকেই আবিষ্কার করে। এর কাহিনী উদ্ভট মনে হলেও এর মধ্যে তুতুওলার অতুলনীয় রসবোধ, কল্পনাশক্তি ও জীবন এবং এর নানান উপষঙ্গের দার্শনিক অনুধাবন সত্যিই বিস্ময়কর। এছাড়া বেন ওকরি খুব

সুক্ষভাবে ইয়োরুবা-মিথোলোজি থেকে উপকরন সংগ্রহ করে তাঁর উপন্যাসের মানুষের প্রত্যাহিক জীবনের নানান ঘটনা ও কাজ-কর্মের সাথে সাজুয্য সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যাজিক রিয়েলিজম বা যাদুবাস্তবতার আবহ তৈরী করেছেন। বুচি এমেশেতার *The Joys of Motherhood* উপন্যাসের দেবতা *চি* এর ভূমিকা এক সৃষ্টি-স্রষ্টার সম্পর্কের টানাপোড়েনের চিত্র অংকন করে। ঐতিহ্যগতভাবে ইবো সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেকের একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা গড আছে। এর নাম *চি*। এর উৎপত্তি মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা থেকে। এক এক *চি* নিয়ন্ত্রণ করে এক এক ব্যক্তিকে। এই চি ব্যক্তির ক্ষতিও করতে পারে, আবার উপকারও করতে পারে। ইবোরা তাদের ভালো-মন্দের জন্য এই *চি* কে দায়ী করে। যদি মৃত পূর্বপুরুষ মৃত্যুকালে অসুখী থাকত বা কম বয়সী হতো তবে তা থেকে যে *চি* এর উদ্ভব হতো সে শুধু মানুষের অনিষ্ট কওে বেড়াত। *The Joys of Motherhood* উপন্যাসের প্রধানতম চরিত্র ননু এগো তার জীবনের নানান দূর্ভোগের জন্য বিশ্বাস করে যে, এর জন্য তার *চি* দায়ী।ননু এগো জানে যে, এই *চি* এক দাসীর আত্মা থেকে উদ্ভব হয়েছে যাকে তরুণ বয়েসে হত্যা করা হয়েছিল তার মনিবের স্ত্রীর সমাধীসঙ্গী হওয়ার জন্য।

এটি সত্য যে, আফ্রিকী সাহিত্যিকদের অন্যতম প্রধান দক্ষতা হলো বাস্তবের সাথে অবাস্তবের, প্রকৃতির সাথে অতিপ্রাকৃতিকের, মানবের সাথে অতিমানবের সংশ্লেষ ঘটানো। এখানেই আফ্রিকী সাহিত্যিকগণ যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা নিজেদের কল্পকাহিনীর নিরেট উপস্থাপন করেননি, বরং তার পুণ:নির্মাণ করেছেন এবং জীবনের সাথে ঘটিয়েছেন সমান্তরলিকরণ যা আফ্রিকী সাহিত্যকে দিয়েছে নতুন আঙ্গিক ও নতুন এক মাত্রা। সৃষ্টি হয়েছে আফ্রিকী প্রপঞ্চ যার মৌলিকত্ত্ব বিশ্বসাহিত্যে স্বতন্ত্র ও চিরভাস্বর।

তথ্যসূত্রঃ

Asante, Molefi Kete and Ama Mazama (eds). *Encyclopedia of African Religion.* Washington: SAGE, 2009. Print.

এমোস তুতওলা, *তালমদিরা মাতাল* (অনুবাদ) কলকাতা: সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৫

জন গান্থার, *আফ্রিকার অভ্যন্তরে* (অনুবাদ), ঢাকা বুক ভিলা, ১৯৬২